



কিন্তু দশেরে জনগণ মালকি হবে না এ কমন ব্যবসা?

লেখক: মসেবাহ উদ্দিনি খান মঠি | প্রকাশিত: 17 October 2026, 02:59 PM | বিভাগ: ফচার



স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছে। ১৯০৫ সাল তথা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করে আসছে। এইচএসবিসি'র ইতিহাসও বাংলাদেশে দীর্ঘ, এর পূর্বসূরি মার্কনেটাইল ব্যাংক-এর কার্যক্রমের ইতিহাস ১৯৫১ থেকে, আর এইচএসবিসি নামে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সিটি (সিআইটিআই) বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল থেকে করপোরেটে ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং করছে। মটেলাইফ বা পুরোনো আলকিও বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন বীমা পলিসির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে সংগ্রহ করে, শত শত কোটি টাকা মুনাফা করছে। সেই মুনাফার একটি বড় অংশ তারা নিজদের দশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশে মানুষ এইসব এমএনসিসি'মূহে ব্যবসার গ্রাহক হবে, কিন্তু তাঁদের মুনাফার অংশীদার হবে না। এই তালিকায় বদিশে ব্যাংক, আরথিক প্রাতিষ্ঠান, ফার্মাসিউটিক্যালস ও তলে কোম্পানির যথেষ্ট পরিমাণে উদাহরণ দেওয়া যায় যারা এ দশে শত শত কোটি টাকার ব্যবসা ও মুনাফা করছে এবং পরবর্তীতে সেই মুনাফা নিজ দশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

শুধু ব্যাংক নয়, ম্যানুফেকচারিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইউনিলিভার, নসেল, ব্রিটিশ শেভরন, বাটা, রকেট, ম্যারকিও সহ অনেকে বহুজাতিক প্রাতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বাজারে ব্যবসা করছে। বাংলাদেশে বিশাল ভোক্তা বাজার, মানুষের সঞ্চার, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অবকাঠামো ও শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে এসব প্রাতিষ্ঠান এখানে দুর্দান্ত ব্যবসা করছে এবং বারিট অঙ্করে মুনাফা করছে। শুধুমাত্র

স্ট্যান্ডার্ড চারটার্ড ২০২৫ সালে প্রফটি করছেলি ২,৮০০ কোটি টাকা। কনিত্তু তাদরে অধিকাংশই দশেরে পুঁজবাজারে তালকিভুক্ত নয়। ব্যবসা করার অধিকার তাদরে অবশ্যই আছে। প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। এই বপিল অর্থনীতৈকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশেরে সাধারণ মানুষেরে অংশীদারত্ব কোথায়? সাধারণ মানুষ তাদরে ব্যবসার শ্রুফে একজন গ্রাহক, কনিত্তু মালকি নয়। সেই মুনাফায় বাংলাদেশেরে সাধারণ মানুষ এবং দশীয় বনিয়োগকারীদরে অংশগ্রহণ থাকবে না কেনে? আর এখানই পুঁজবাজারেরে গুরুত্ব।

একটি কোম্পানি যদি বাংলাদেশে ব্যবসা করে, বাংলাদেশেরে বাজার থেকে আয় করে এবং বাংলাদেশেরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অর্থায়ন নেয়, রাষ্ট্রেরে অবকাঠামো ব্যবহার করে তাহলে সেই কোম্পানিরি মালকিনায় বাংলাদেশেরে সাধারণ বনিয়োগকারীদরে অংশগ্রহণেরে সুযোগ থাকা উচিত। পুঁজবাজারে তালকিভুক্ত হলে সাধারণ মানুষ শয়োর কনি সেই ব্যবসার অংশীদার হতে পারে। একই সঙ্গে কোম্পানিরি আর্থিক হিসাব, সম্পদ, ঋণ, মুনাফা ও পরিচালনা সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদহিতি তরৈহয়। দুঃখজনকভাবে সত্য বাংলাদেশে ২০১০ সালে ৫০ কোটি টাকার বশেপরিশোধতি মূলধন হলে আইপিও'র বধিান ছিল, কনিত্তু ২০১৯ সালে সেই নোটফিকেশন বাতলি করা হয়।

একটি কোম্পানি ব্যাংক থেকে বপিল ঋণ নবে, ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে কনিত্তু পুঁজবাজারে আসবে না। অথচ তালকিভুক্ত হলে সাধারণ জনগণও সেই ব্যবসার অংশীদার হতে পারত এবং কোম্পানিরি ওপর বাজারভিত্তিকি অতিরিক্ত নজরদারি তরৈহতো। আমাদেরে অর্থায়ন ব্যবস্থার এখানই বড় দুর্বলতা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা এটাই যনে নয়িম। অথচ হওয়া উচিত ছিল পুঁজবাজার ও ব্যাংক দুই ব্যবস্থার সমন্বতি ব্যবহার।

এখানে পাবলিক ইন্টারসেট কোম্পানি নীতমালা অত্য়ন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, বড় এবং অর্থনীততিে প্রভাবশালী কোম্পানিগুলোকে পুঁজবাজারে আনার বাধ্যবাধকতা তরৈকিরা গলে শুল্ক শয়োরবাজারেরে আকারই বাড়বে না, সাধারণ মানুষও দশেরে বড় বড় ব্যবসা ও শলিপরে সম্পদ সৃষ্টিরি প্রকরিয়ায় অংশীদার হতে পারবে। আমরা বহুজাতিকি কোম্পানিরি বিরুদ্ধে নই। বরং তারা বাংলাদেশে আসুক, বনিয়োগ করুক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুক, প্রযুক্তি আনুক এবং মুনাফা করুক এটাই স্বাভাবকি। কনিত্তু একই সঙ্গে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদহিতি, সুশাসন এবং যখনে প্রয়োজ্য সখনে স্থানীয় বনিয়োগকারীদরে অংশগ্রহণেরে সুযোগ।

বাংলাদেশেরে অর্থনীতি যদি সত্যই অন্তর্ভুক্তমূলক করতে হয়, তাহলে শুল্ক কয়কেজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী বড়লোক হবনে এমন অর্থনীতি নয়; সাধারণ মানুষও যনে দশেরে অর্থনীতৈকি প্রবৃদ্ধিরি মালকিনা ও সম্পদ সৃষ্টিরি অংশীদার হতে পারনে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একটি বিকাশমান

অর্থনীতিরি লক্ষ্য হওয়া উচিত শুল্ক ব্যাংকমুখী অর্থনীতি নয়, শক্তিশালী পুঁজবাজারভিত্তিকি অর্থনীতি। শুল্ক গ্রাহক নয়, সাধারণ মানুষকে বনিয়োগকারী ও অংশীদার করা।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য কয়েকটি ব্যাংকের ঋণ কলেঙ্কারি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেসে স্টাডিতে পারে। এস আলম ও তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল পরমাণ ঋণ নেওয়া এবং সেই অর্থের বড় অংশ বদেশে পাচারের মাধ্যমে দেশেরে অর্থনৈতিক মরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশেষ করে অনেকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল তুলনামূলকভাবে নতুন ও নামসর্বস্ব কোম্পানির নামে। এখানই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে যদি কোনো কোম্পানি শত বা হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ নতি চায়, তাহলে ওই কোম্পানির মালিকানা, সম্পদ, ব্যবসা, আর্থিক সক্ষমতা ও প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি শক্তিশালী জনসাধারণের নজরদারি থাকা জরুরি।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির অন্যতম বড় সুবিধা এখানই। একটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হলে তার আর্থিক হিসাব, সম্পদ, দায়, মালিকানা, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হয়। নরীক্সা, ডিসক্লোজার এবং রগুলটেরী ওভারসাইট-এর কারণে একটি শিলে বা নামসর্বস্ব কোম্পানির পক্ষে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়ে যায়। তাই একটি নীতিগত প্রশ্ন সামনে আসছে কোনো কোম্পানি যদি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বৃহৎ ব্যাংক ঋণ নতি চায়, তাহলে তাকে আগে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তের আওতায় আনতে হবে। আমার মতে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্কে ববিচনা করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি কোম্পানিকে ছোট অর্থায়নের জন্যও শোরবাজারে আসতে হবে। বরং বৃহৎ ঋণগ্রহীতা কোম্পানির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা যতে পারে। সেই সীমার বেশি ঋণ নতি হলে কোম্পানিকে প্রথমতে নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ, নরীক্সা, মালিকানার স্বচ্ছতা এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।

নীতিটি হতে পারে বড় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকের ঋণযোগ্যতা যাচাই যথেষ্ট নয়; কোম্পানির মালিকানা, আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ওপর পুঁজিবাজারভিত্তিক জনসমীক্ষাও থাকা উচিত। এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে ব্যাংকের বড় ঋণের ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে জনগণের অর্থেরে নরিপত্তা বাড়বে। একই সঙ্কে পুঁজিবাজারে ভালো ও বড় কোম্পানির তালিকাভুক্তিও বাড়বে। ইসলামী ব্যাংকসহ সাম্প্রতিক ব্যাংকিং সংকটেরে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো বিপুল ব্যাংক ঋণ যদি স্বচ্ছ মালিকানা, শক্তিশালী ডিসক্লোজার এবং জনগণের কাছে জবাবদহিতির বাইরে থাকে, তাহলে সেই অর্থেরে অপব্যবহার ও পাচারেরে ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই এখন সময় এসছে মানি মার্কেটে বা ব্যাংক ও পুঁজিবাজারকে আলাদা দুটি সত্ত্বা হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টিমে হিসেবে দেখার। বৃহৎ ঋণেরে ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু শোরবাজার উন্নয়নেরে বিষয় নয়, এটি ব্যাংকের অর্থ, আমানতকারীর অর্থ এবং দেশেরে জনগণের অর্থ সুরক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কোম্পানিকেও পুঁজিবাজারেরে জবাবদহিতির আওতায় আনতে হবে। একইভাবে সরকার নিয়ন্ত্রতি বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ও শলিপপ্রতিষ্ঠানকেও পাবলিক লসিটিং-এর আওতায় আনা যতে

পারে। এর মাধ্যমে এসব প্রতীষ্ঠানকে স্বচ্ছতা, জবাবদায়িত্ব, দক্ষতা ও গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। একটি কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে তাকে নিয়মিত বার্ষিক প্রতীক্ষণ, নীতিমূলক আর্থিক বিবরণী, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হয়। পাশাপাশি স্বতন্ত্র পরিচালক এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের ওপরও বাড়তি জবাবদায়িত্ব তৈরি হয়।

একটি প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে তাই শুধু বেসরকারি ভালো কোম্পানিকে নয়, জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধীরে ধীরে পুঁজিবাজারে নবীকরণ ও লেনদেনের আওতায় আনা প্রয়োজন। এটি শুধু পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের বিষয় নয়; এটি হতে পারে কর্পোরেট সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সরকারের সঠিক ও দূরদর্শী নীতি, কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দৃঢ় সদৃষ্ট থাকলে রাষ্ট্রীয় ও বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারে সঙ্গত যুক্ত করে বাংলাদেশে অর্থনীতির জন্য একটি অধিকতর স্বচ্ছ, জবাবদায়িত্বমূলক ও সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। পুঁজিবাজারকে শুধু বিনিয়োগের বাজার হিসেবে নয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জবাবদায়িত্বের একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবেও দেখতে হবে।